

জুলাই অভ্যুত্থানের অর্জন, বর্জন ও বিসর্জন

সায়ন্ত সাখাওয়াৎ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে জুলাই অভ্যুত্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটি শুধু একটি রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের বিষয় নয়; বরং এটি ছিল বৈষম্য, ক্ষমতার অপব্যবহার, জবাবদিহির সংকট এবং নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা থেকে উৎসারিত এক সামাজিক-রাজনৈতিক জাগরণ। এই অভ্যুত্থানের পেছনে কাজ করেছিল এমন একটি রাষ্ট্রের স্বপ্ন, যেখানে নাগরিকের মর্যাদা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, আইনের শাসন এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে।

দীর্ঘ দেড় দশক আন্দোলন সংগ্রাম ও রাষ্ট্র মেরামতের রূপরেখা দিয়ে দেশবাসীর মনে এই স্বপ্ন জাগিয়েছে প্রধানত বিএনপি। বিএনপির নেতাকর্মীরা গণতন্ত্র ও ভোটের অধিকার ফিরে পেতে শুধু জেল-জুলুমের শিকার হননি, জীবনও দিয়েছেন অনেকে। গুম-খুনের শিকার হয়েছেন বহু নেতাকর্মী। এবং এই নৃশংসতার কাজে ফ্যাসিবাদী সরকার ব্যবহার করেছে রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে। তাই বিএনপি চেয়েছিল, রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে যেন কোনো সরকার অন্যায়ভাবে ব্যবহার করতে না পারে। বিচার বিভাগে গিয়ে ন্যায়বিচার পাওয়া যেত না। বিচারপতিদের কেউ বলতেন, তারা শপথবদ্ধ রাজনীতিবিদ। এই অনাচার থেকে বিএনপি বিচার বিভাগকে রক্ষা করতে চেয়েছিল।

দেশের সবগুলো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে ফ্যাসিবাদী সরকার তাদের ক্ষমতায় থাকবার হাতিয়ারে পরিণত করেছিল। বিএনপি ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার চেয়েছিল। সরকারি দল সব কিছু তাদের রাখতে মরিয়া হয়ে বিরোধী দলকে কোণঠাসা করতে করতে গণতন্ত্রকেই কোণঠাসা করতে করতে নির্বাসনে দিয়েছিল। তাই বিএনপি সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ভারসাম্য চেয়েছিল। এমনি দেশে একটি টেকসই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে যা যা করণীয় তার প্রায় সব বিষয়ে বিএনপি তাদের দাবি ও প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছিল। দলটি এ সব কথা শুধু মেঠো বক্তৃতায় ছুড়ে দিয়ে বসে থাকেনি। তারা ভিশন ২০৩০ রচনা করে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে। তারা রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা দিয়ে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করেছে, স্বপ্ন জাগিয়েছে। বিএনপির এই দাবিই এক সময় জনদাবিতে পরিণত হয়েছিল।

তারই চূড়ান্ত রূপ ছিল ২০২৪ সালের ৩৬ জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থান। প্রায় দেড় হাজার মানুষ জীবন দিল। কতজন চোখ হারালো। তারা দৃষ্টি বিসর্জন দিয়ে আমাদের এক নতুন বাংলাদেশ দেখার সুযোগ করে দিল। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় প্রশ্ন উঠেছে, জুলাই অভ্যুত্থানের যে আকাঙ্ক্ষা, যে চেতনা এবং যে ঐক্য মানুষকে রাজপথে এনেছিল, আমরা কী সেই অর্জনগুলো ধরে রাখতে পেরেছি, নাকি ধীরে ধীরে সেগুলো বিসর্জন দিচ্ছি?

জুলাই অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক শক্তি পেছনে থেকে মূল শক্তি জোগালেও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল জয়ের প্রধান নিয়ামক। শিক্ষার্থী, তরুণ, শ্রমজীবী মানুষ, পেশাজীবী, নারী-পুরুষ-সবাই একটি অভিন্ন আকাঙ্ক্ষায় একত্রিত হয়েছিলেন। সেই আকাঙ্ক্ষা ছিল এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করা, যেখানে ব্যক্তি বা দলের উর্ধ্বে থাকবে জনগণের স্বার্থ। কেউ তখন ব্যক্তিগত ক্ষমতা, দলীয় আধিপত্য বা রাজনৈতিক লাভের জন্য আন্দোলনে নামেননি; বরং একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশাই ছিল তাদের প্রেরণা।

জুলাই অভ্যুত্থানের পেছনে যে আকাঙ্ক্ষা কাজ করেছে, তা ছিল বহুমাত্রিক। প্রথমত, এটি ছিল একটি জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার দাবি। দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব, প্রশাসনিক অকার্যকারিতা এবং বিচারিক নিরপেক্ষতা নিয়ে যে প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল, অভ্যুত্থান সেই সংকটের বিরুদ্ধে জনমতের বিস্ফোরণ ঘটায়।

দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের অন্যতম ভিত্তি ছিল নাগরিক অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, আইনের সমান প্রয়োগ এবং রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের আস্থার পুনর্গঠন ছিল এর অন্যতম লক্ষ্য। তৃতীয়ত, এই অভ্যুত্থান নতুন প্রজন্মের রাজনৈতিক আত্মপ্রকাশের প্রতীক। তরুণ সমাজ প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে রাষ্ট্র কেবল রাজনৈতিক দলের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়; বরং এটি জনগণের সম্মিলিত মালিকানার প্রতিষ্ঠান। তাই জুলাইয়ের চেতনা মূলত ব্যক্তি-নির্ভর নয়, বরং প্রতিষ্ঠানভিত্তিক রাষ্ট্র নির্মাণের দর্শনকে ধারণ করে।

এই অভ্যুত্থানের ফলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পরিবর্তনও এসেছে। রাষ্ট্র পরিচালনা, নির্বাচন ব্যবস্থা, প্রশাসনিক সংস্কার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, দুর্নীতি দমন, মানবাধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। তরুণ সমাজ রাজনীতির প্রতি নতুন আগ্রহ দেখাচ্ছে যারা চূড়ান্তভাবে রাজনীতি বিমুখ হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে যে বিষয়গুলো উপেক্ষিত ছিল, যা বিএনপি লিখিত আকারে প্রস্তাব করেছিল, সেগুলো জাতীয় আলোচনার কেন্দ্রে এসেছে। জনগণ উপলব্ধি করছে যে সংগঠিত নাগরিক শক্তি রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে প্রভাব ফেলতে পারে। সবচেয়ে বড়ো অর্জন হলো, মানুষ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে আগের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন হয়েছে এবং জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার দাবি আরও জোরালো হয়েছে।

তবে এই ইতিবাচক অর্জনের পাশাপাশি একটি উদ্বেগজনক বাস্তবতাও তৈরি হয়েছে। অভ্যুত্থানের পরপরই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন এবং নানা গোষ্ঠীর মধ্যে জুলাই অভ্যুত্থানের কৃতিত্ব দাবি করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কেউ এটিকে নিজেদের রাজনৈতিক বিজয় হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছে, কেউ আবার এটিকে নিজেদের আদর্শের একচ্ছত্র সাফল্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। ফলে যে আন্দোলনের শক্তি ছিল সর্বজনীনতা ও ঐক্য, সেটি ধীরে ধীরে বিভক্তির দিকে যেতে শুরু করেছে।

জুলাইয়ের চেতনাকে যখন একটি নির্দিষ্ট দল, মত বা গোষ্ঠীর সম্পত্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, তখন সেই চেতনার সর্বজনীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। আন্দোলনে অংশ নেওয়া অসংখ্য সাধারণ মানুষের অবদান আড়ালে পড়ে যায়। ইতিহাসের মালিকানা কোনো ব্যক্তি বা দলের নয়; এটি জনগণের। কিন্তু যখন ইতিহাসকে রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তখন আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে আন্দোলনের পক্ষের শক্তিগুলোর মধ্যেই অবিশ্বাস, প্রতিযোগিতা এবং বিভেদ তৈরি হয়, যা ভবিষ্যতের গণতান্ত্রিক যাত্রার জন্য শুভ লক্ষণ নয়।

আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, জুলাইয়ের চেতনার নামে অনেক সময় এমন কর্মকাণ্ড দেখা যায়, যা মূল আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যদি কোনো গোষ্ঠী মনে করে যে শুধু তারা ই জুলাইয়ের প্রকৃত জুলাই অভ্যুত্থানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ছিল, রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তি বা দলের নয়, এটি জনগণের। কিন্তু যদি রাষ্ট্রের প্রতিটি সিদ্ধান্তকে দলীয় আনুগত্যের মানদণ্ডে বিচার করা হয়, অথবা সংস্কারের পরিবর্তে প্রতিশোধের রাজনীতি প্রাধান্য পায়, তাহলে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ হয় না। মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল শুধু ক্ষমতার পালাবদল নয়; তারা চেয়েছিল রাজনৈতিক সংস্কৃতি, প্রশাসনিক আচরণ এবং শাসনব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন। সেই পরিবর্তন বাস্তবায়িত না হলে অভ্যুত্থানের অর্জন ধীরে ধীরে স্তান হয়ে যেতে পারে।

জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনাকে রক্ষা করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন এই আন্দোলনকে কোনো একক ব্যক্তি বা দলের সম্পত্তি হিসেবে না দেখা। এটি ছিল জনগণের আন্দোলন, তাই এর কৃতিত্বও জনগণের। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক সহযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। তৃতীয়ত, সংস্কার প্রক্রিয়াকে ব্যক্তি বা দলকেন্দ্রিক না করে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক করতে হবে, যাতে ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিগুলো বদলে না যায়। সর্বোপরি, নতুন প্রজন্মের কাছে জুলাইয়ের শিক্ষা পৌঁছে দিতে হবে।

রাষ্ট্র নির্মাণের মূল শক্তি রাজনৈতিক দল। আর রাজনৈতিক দলের শক্তির উৎস জনগণ। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সেই জনগণের অংশগ্রহণই অর্জিত হয়েছে নতুন বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ। এখানে যা কিছু নতুন বাংলাদেশ গড়ার পথে আন্ডরায়, তা বর্জন করতে হবে। তবে কোনোভাবেই জনআকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দেয়া যাবে না। একটি টেকসই গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণই যেনো হয় প্রধান লক্ষ্য।

খিস স্কোকপোল (১৯৭৯) ফ্রান্স, চায়না ও রশিয়ান বিপ্লব নিয়ে রচিত গবেষণা গ্রন্থ স্টেটস এন্ড সোশ্যাল রেভোলুশানস - এ দেখিয়েছেন যে, বিপ্লবের পরে ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস প্রায়শই বিপ্লবের ঘোষিত আদর্শকে দুর্বল করে দেয়, যদি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার কাছে পরাজিত হয়।

একইভাবে টার্কিশ-আমেরিকান অর্থনীতিবিদ দারোন আজেমোলু ও ব্রিটিশ-আমেরিকান অর্থনীতিবিদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী - জেমস এ. রবিনসন (২০১২) -এর বক্তব্য হলো, টেকসই রাজনৈতিক পরিবর্তন তখনই সম্ভব, যখন রাষ্ট্র অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। অন্যথায় ক্ষমতার কেবল বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু শাসনব্যবস্থার মৌলিক চরিত্র অপরিবর্তিত থেকে যায়।

বাংলাদেশে যদিও সত্যিকার অর্থে বিপ্লব হয়নি, হয়েছে গণঅভ্যুত্থান। কিন্তু সেই গণঅভ্যুত্থানেও তো একটা গণআকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে। সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পথে কী বাংলাদেশ আছে? নাকি খিসা স্কোকপোল, দারোন আজেমোলু ও জেমস এ. রবিনসনের আশঙ্কাকার পথেই হাঁটছে জুলাই পরবর্তী বাংলাদেশ?

#

লেখক : চিকিৎসক, লেখক ও রাজনীতি বিশ্লেষক

পিআআডি ফিচার